# স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বর্তমান হালচাল

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (০৬ মে, ২০০৯)

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ে বর্তমানে একটি হ-য-ব-র-ল অবস্থা বিরাজ করছে। নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ১৯৯৮ সালের উপজেলা পরিষদ আইন সংশোধন করে উপজেলা পরিষদের ওপর মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বহুমুখী হস্তক্ষেপের কারণে ইউনিয়ন পরিষদও বর্তমানে প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে। সাংসদগণ এখন পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে তাঁদের খবরদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট সাংবিধানিক অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও, পুরো ব্যবস্থাই আজ প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এ অবস্থা কোনোভাবেই কাম্য নয় এবং এর পরিণামও ভয়াবহ হতে বাধ্য।

## স্থানীয় সরকার ও এর বৈশিষ্ট্য

আমাদের সংবিধানে স্থানীয় সরকারের কোন সংজ্ঞা নেই। তবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিখ্যাত *কুদরত-ই-এলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ* [44DLR(AD)(1992)] মামলার রায় অনুযায়ী, স্থানীয় সরকার হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার লক্ষ্য স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যার সমাধান। (Local government is 'meant for management of local affairs by locally elected persons.')। অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের 'সেলফ গভার্নমেন্ট' বা স্বশাসন প্রতিষ্ঠাই স্থানীয় সরকারের লক্ষ্য।

স্থানীয় সরকার সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে হলে এর প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা আবশ্যক। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: (১) এটি একটি নির্বাচিত – স্থানীয় সরকারের জন্য নির্বাচিত – প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান। (২) এতে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। (৩) এটি হতে হবে 'ইনক্লুসিভ', অর্থাৎ এতে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। (৪) এটি হতে হবে স্বায়ত্তশাসিত বা 'সেলফ গভর্নিং'। (৫) স্থানীয় সরকারের প্রত্যেকটি স্তর হতে হবে একে অপর থেকে স্বাধীন – অর্থাৎ এক স্তর দ্বারা অন্য স্তর নিয়ন্ত্রিত নয়। (৬) এর প্রাতিষ্ঠানিক ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা থাকা অতি আবশ্যক। নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ, অডিট ইত্যাদি মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং 'ওয়ার্ড-সভা' বা গ্রাম-সভার মাধ্যমে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হতে পারে। (৭) স্থানীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব থাকতে হবে, একইসাথে থাকতে হবে কর আরোপের অধিকার। *কুদরত-ই এলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ* মামলার রায়ে বিচারপতি মোস্তফা কামাল এ সকল বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

## স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব

স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত, সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়। এছাড়াও এর মাধ্যমে সর্বস্তরে নের্তৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

আমাদের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। শুধু কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেই গণতন্ত্র কায়েম হয় না, এর জন্য সকল প্রশাসনিক একাংশ বা স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন কায়েম হওয়া আবশ্যক। আবশ্যক 'গ্রাসরুট ডেমোক্রেসি' বা তৃণমূলের গণতন্ত্র। প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমেই তা সম্ভব। এছাড়াও সর্বস্তরে প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়া একমাত্র নির্বাচিত সংসদকেন্দ্রীক ব্যবস্থাকে 'খুঁটিহীন' গণতন্ত্র বলা চলে, আর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, খুঁটিহীন গণতন্ত্র টিকে থাকে না।

আমাদের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে জনগণকে সকল ক্ষমতার মালিক বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। জনগণের দোরগোড়ার সরকার হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা এ ক্ষমতা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারে। এভাবেই যে সকল সিদ্ধান্ত তাদের জীবনকে সরাসরিভাবে প্রভাবিত করে সেগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা অংশ নিতে পারে – কারণ সাধারণ জনগণ যে সকল সমস্যার প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হয়, সেগুলোর সিংহভাগই স্থানীয় এবং সেগুলোর সমাধানও স্থানীয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে বিরাজমান 'প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র' 'অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে' রূপ নিতে পারে, যা নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের উন্নততর সংস্করণ। অর্থাৎ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাই 'গিভিং পাওয়ার টু দি পিপল' বা জনগণকে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়ার উৎকৃষ্টতম মাধ্যম।

শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাই ক্ষমতা, দায়-দায়িত্ব ও সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যম। সর্বস্তরে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অভাবে আমাদের দেশে বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে অতীতে সবকিছুই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আর কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থাই অপচয়, অদক্ষতা ও দুর্নীতির জন্ম দেয়। এছাড়াও ভুললে চলবে না যে, পাকিস্তানের অতি কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থায়ই বাঙ্গালীরা ব্যাপকভাবে বঞ্চিত হয়েছে এবং 'পিন্ডি-না-ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা' এই শ্লোগান তুলে বীর মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে।

শাসনকার্যে জনগণের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার চর্চা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। প্রশাসনের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমেই এগুলোর চর্চা সম্ভব। ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রাম-সভা বা ওয়ার্ড-সভা এবং অন্যান্য স্তরেও একই ধরনের কাঠামো তা নিশ্চিত করতে পারে। উল্লেখ্য যে, দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৫ সালে তাঁর *দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তা ভাবনা* গ্রন্থে এ ধরনের কাঠামোর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি, পয়ঃনিস্কাশনসহ অন্যান্য সেবা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে এগুলো জনগণের কাছে সহজপ্রাপ্য ও সহজলভ্য এবং সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা সম্ভব, যে আকাঙ্ক্ষা আমাদের সংবিধানেও ব্যক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও বিকেন্দ্রীভূত স্থানীয় সরকারই সম্পদ সরাসরি জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে পারে, তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যা অপরিহার্য। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় করা বিরাট অংকের অর্থের সুবিধার ছিটে-ফোঁটাই বর্তমানে সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে। এছাড়াও স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে ব্যয় হলেই এডিপি বাস্তবায়নের হার বাড়বে, যা বর্তমানে অত্যন্ত নিরাশাব্যঞ্জক।

উপরন্তু তৃণমূলের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত পদক্ষেপ আবশ্যক। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই জনগণকে সম্পৃক্ত করে এমন কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব। প্রসঙ্গত, স্থানীয় জনগণের নেতা হিসেবে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনুঘটকসুলভ নেতৃত্বের মাধ্যমে জনগণকে জাগিয়ে তুলে ও সংগঠিত করে সামাজিক আন্দোলন বা প্রতিরোধ গড়ে তুলে অনেক সামাজিক সমস্যা (যেমন, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি) প্রায় বিনা খরচেই সমাধান করা সম্ভব। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সর্বস্তরে একটি শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে তৃণমূলের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অতীতে ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে এবং পল্লী-শহর বৈষম্য ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভবিষ্যতে সামাজিক অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নেতৃত্ব সৃষ্টির সূঁতিকাগার। বলা বাহুল্য যে, অতীতে সর্বস্তরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টি না করার কারণে আজ আমাদের দেশে সকল স্তরে অভিজ্ঞ, যোগ্য ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নেতৃত্বের ব্যাপক শূণ্যতা বিরাজ করছে। দুর্ভাগ্যবশত জাতিকে আজ এর মাশুল গুণতে হচ্ছে।

## স্থানীয় সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তি

স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদের প্রাজ্ঞ সংবিধান প্রণেতাগণ বাংলাদেশ সংবিধানে এ সম্পর্কে ৪টি অনুচ্ছেদ – ৯, ১১, ৫৯, ৬০ – অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অনুচ্ছেদ ৯-তে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান এবং এগুলোতে কৃষক, শ্রমিক এবং নারীদের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১১-তে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এ দু'টি অনুচ্ছেদ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত, তাই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এগুলো মেনে চলতে সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে, সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে বাধ্য করতে পারে না।

সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান' করার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। 'প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য' পরিচালনা, 'জনশৃঙ্খলা রক্ষা', 'পাবলিক সার্ভিস' বা জনকল্যাণমূলক সেবা ও 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন' স্থানীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সংবিধান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপরই স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসন পরিচালনা থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম, তথা, 'স্থানীয় শাসন' পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

অনুচ্ছেদ ৬০-এ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করেছে। তবে সংসদ আইনের দ্বারা অন্যান্য ক্ষমতা এবং দায়িত্বও স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠার ওপর অর্পণ করতে পারে। কিন্তু *কুদরত-ই এলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ* মামলার রায় অনুযায়ী, 'সংসদ স্থানীয় সরকারের ব্যাপারে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদকে উপেক্ষা করতে পারে না।' ('Parliament is not free to legislate on local government ignoring Article 59 and 60.') এছাড়াও ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয় বলে আদালতও সরকারকে এগুলো পালন করতে বাধ্য করতে পারে।

প্রতিবেশি ভারতসহ অন্যান্য অনেক দেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকারের বিধান যখন অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন ছিল, তখন এ সম্পর্কিত আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও অনেকের মতে প্রগতিশীল। *কুদরত-ই এলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ* মামলার রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিজ্ঞ বিচারক জনাব মোস্তফা কামাল বলেন যে, বাংলাদেশ সংবিধানের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম একটি সমন্বিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন করেছে।

## স্থানীয় সরকারের বর্তমান অবস্থা

স্থানীয় সরকারের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট সাংবিধানিক অঙ্গীকার থাকা স্বত্ত্বেও – সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদে জেলাকে প্রশাসনিক একাংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে – স্বাধীন বাংলাদেশে অদ্যবধিও জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নির্বাচন না হলে পরিষদ গঠিত হয় না।

গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রণীত একটি অধ্যাদেশের ভিত্তিতে ২২ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রায় দুই দশক পরে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু নবনির্বাচিত সরকার অধ্যাদেশটি অনুমোদন না করে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রণীত *উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮* সংশোধিত আকারে অনুমোদন করে। এ আইনের কতগুলো গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

- আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত সংসদ সদস্য উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হবেন এবং পরিষদকে উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও আইনে (ধারা ৪২) সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণপূর্বক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিধান করা হয়েছে। এমনকি সরকারের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও পরিষদের পক্ষ থেকে সাংসদকে অবহিত করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ সকল বিধানের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের ওপর স্থানীয় সংসদ সদস্যদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা বহু পরীক্ষিত 'ক্ষমতার বিভাজন নীতি'র (principles of separation of powers) পরিপন্থি। এছাড়াও সাংসদগণ সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের অধীনে 'আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা' প্রয়োগের জন্য নির্বাচিত, উপজেলা পরিষদ পরিচালনার জন্য নয়। তাই আইনটি সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। উপরন্তু এটি *আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বনাম বাংলাদেশ* [16BLT(HCD)(2008)] মামলায় বাংলাদেশ হাইকোর্টের রায়েরও পরিপন্থি। উপরিউক্ত রায়ে বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির সুস্পষ্টই বলেছেন যে, সংসদ সদস্যদের জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কিংবা অন্য কোন প্রশাসনিক স্তরে উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দায়-দায়িত্ব পালনের কোন এখতিয়ার নেই।
- আইনটি গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের সাথেও অসঙ্গতিপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের ওপর সাংসদদের কর্তৃত্ব নিশ্চিত হয়েছে, কিন্তু তাঁদের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। দায়বদ্ধতাহীন কর্তৃত্ব স্বৈরতন্ত্রেরই উদ্ভব ঘটায়।
- উপজেলা আইনটি চরমভাবে বৈষম্যমূলক। কারণ এতে একক আঞ্চলিক এলাকা থেকে নির্বাচিত ৩০০ জন সাংসদকেই উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা করা হয়েছে, সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত বাকি ৪৫ জন নারী সদস্যের এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখা হয়নি।
- এটি একটি 'রঙিন' বা বিকৃত আইন (colourable legislation) – যা প্রত্যক্ষভাবে করা যায় না, আইন করে পরোক্ষভাবে তা করলে সে আইনকে রঙিন আইন বলা হয়। সাংসদগণ জাতীয় সংসদের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত, তাঁদের দিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করলে নিঃসন্দেহে সেসব প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় সরকার বলা যাবে না, যেমনিভাবে সরকারি কর্মকর্তাদেরকে দিয়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকার নয় (*কুদরত-ই-এলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ*)।
- প্রধান নির্বাহি হিসেবে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হলেও, সংশোধিত আইনের মাধ্যমে উপজেলা চেয়ারম্যানকে পরিষদের প্রধান নির্বাহি হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আইনের ২৬(২) ধারা অনুযায়ী, 'পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা পরিষদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সদস্য বা অন্য কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে।' এই বিধানের ফলে উপজেলা পরিষদে প্রধান নির্বাহির পদ নিয়ে অশুভ খেলা খেলার সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- আইনের ৫০ ও ৫১ ধারায় পরিষদের উপর সরকারের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা স্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার চেতনার পরিপন্থি।
- আইনটি উপরোল্লেখিত স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথেও অসঙ্গতিপূর্ণ।
- সংশোধিত আইনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর *দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তা ভাবনা* গ্রন্থে উল্লেখিত স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত অনেকগুলো বলিষ্ঠ ধ্যান-ধারণার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রণীত অধ্যাদেশে অনেকগুলো প্রগতিশীল বিধান ছিল, যা সংশোধিত আইনটিতে অনুপস্থিত। যেমন, তথ্য অধিকারের বিধান, সিটিজেন চার্টার প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি। এছাড়াও অধ্যাদেশে নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতাকে আরো কঠোর করা হয়েছিল, যা অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিদেরকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারতো।

আইনগত সীমাবদ্ধতা ছাড়াও, উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেকগুলো জটিল, এমনকি ভয়াবহ সমস্যা দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে অনেক উপজেলার কর্তৃত্ব মাননীয় সংসদ সদস্যগণ নিয়ে নিয়েছেন। বিরোধী দলের উপজেলা চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে এ কর্তৃত্ব অযৌক্তিক পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাংসদের প্রতিনিধি হিসেবে দলীয় নেতারাও উপজেলার ওপর কর্তৃত্ব করছেন। উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তাগণও অনেকক্ষেত্রে, সম্ভবত বাধ্য হয়ে, উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের পরিবর্তে সাংসদের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করছেন। এ অবস্থা উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাকেই অকার্যকর করে তুলতে পারে। উপজেলা পরিষদ নিয়ে আরেকটি জটিলতার উৎস হলো যে, অনেক উপজেলায় একাধিক সাংসদ রয়েছেন। এছাড়াও এর মাধ্যমে একটি অহেতুক দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি

করা হয়েছে, যার বিস্ফোরণ অবসম্ভাবী। উপরন্তু, উপজেলা প্রশাসনকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্তৃত্বে এনে বর্তমানের স্থবির অবস্থাকে চাঙ্গা করার আকাঙ্ক্ষাও ভেস্তে যাবে, যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে।

শুধু উপজেলা পরিষদেরই নয়, ইউনিয়ন পরিষদেরও বর্তমানে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। আইনগত কোনো ভিত্তি না থাকলেও, অনেক সাংসদ বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদকে অযাচিতভাবে পরামর্শ দিচ্ছেন এবং পরিষদকে এ পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করছেন। এছাড়াও কিছু সাংসদ দলীয় নেতা-কর্মীদের ইউনিয়ন পরিষদের ওপর খবরদারিত্ব করার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উপরন্তু দলীয় ক্যাডারদের চাপে অনেক ইউনিয়ন পরিষদই স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না।

ইউনিয়ন পরিষদের জন্য গোদের ওপর এখন বিষফোঁড়া হিসেবে দেখা দিয়েছেন কিছু উপজেলা চেয়ারম্যান – তাঁরা আইন বহির্ভূতভাবে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্থানীয় সরকারের কোনো স্তরই অন্য স্তরের নিয়ন্ত্রণে নয়, প্রত্যেক স্তরই স্বাধীন স্বত্ত্বার অধিকারী। অর্থাৎ সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত জেলা পরিষদের ওপর জেলার, নির্বাচিত উপজেলার ওপর উপজেলার এবং নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের ওপর ইউনিয়নের 'স্থানীয় শাসনের ভার' অর্পিত হওয়ার কথা – সংশ্লিষ্ট স্তরের বাইরের কার্যক্রম তাদের এখতিয়ার বহির্ভূত। এখতিয়ার নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত দ্বন্দ্বের কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে মামলাও হয়েছে। কিছু উপজেলা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে স্থানীয় পর্যায়ে অনাকাঙ্ক্ষিত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টারও অভিযোগ উঠছে।

এরশাদ আমল থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদেরকে ফায়দা দেয়ার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'পল্লী পরিষদ', 'গ্রাম পরিষদ' ও 'গ্রাম সরকার' সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হয়। গ্রাম সরকারকে অসাংবিধানিক ঘোষণার পরও এ গর্হিত কাজটি থেমে থাকে নি। মাননীয় সংসদ সদস্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় দলীয় ব্যক্তিরা বর্তমানে এ কাজটি অনানুষ্ঠানিকভাবে করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। শোনা যায় যে, ভবিষ্যতে সাংসদদেরকে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি' গঠনের এখতিয়ার দেয়া হবে। এর ফলে দলীয় নেতা-কর্মীদের ফায়দা দেয়ার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকতা লাভ করবে, যা ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকারিতা আরো খর্ব করবে।

## উপসংহার

একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিতে অর্জিত স্বাধীনতাকে সাধারণ জনগণের জন্য অর্থবহ করার লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে একটি শক্তিশালী, গতিশীল ও সমন্বিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার বলিষ্ঠ অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাবে আজকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা একটি বেহাল অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছে। *কুদরত-ই-এলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ* মামলার সর্বসম্মত রায়ে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ৬ মাসের মধ্যে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিলেও, অদ্যাবধিও নির্বাচিত জেলা পরিষদ গঠিত হয় নি। জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণ উপজেলা পরিষদের ওপর তাদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ১৯৯৮ সালের উপজেলা আইনটিকে সংশোধিত আকারে পাশ করেছেন। আইনটি আমাদের সংবিধান ও আদালতের রায়ের সঙ্গে শুধু অসঙ্গতিপূর্ণই নয়, এটি জাতি হিসেবে আমাদের অগ্রযাত্রাকেও ব্যাহত করবে। নানামুখী চাপে ইউনিয়ন পরিষদও আজ অকার্যকর হওয়ার পর্যায়ে। সাংসদগণ এখন তাঁদের খবরদারিত্ব পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন পর্যায়ে বিস্তৃত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। মোটকথা, আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আজ অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি।

শেষ করছি আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব এএমএ মুহিতের লেখা উপজেলা আইন সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। বর্তমান আইনের পূর্বসূরী উপজেলা আইন ১৯৯৮ সালে বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত হলে তিনি সেটির কড়া সমালোচনা করেন। পরবর্তীতে ২০০২ সালে প্রণীত 'জেলায় জেলায় সরকার' বইয়ে তিনি লিখেন: 'উপজেলায় অর্থাৎ থানায় সেই ১৯৬১ সাল থেকে একটি কার্যকরী প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপনের কাজ শুরু হয়। ১৯৮২-৮৩ সালে উপজেলা পরিষদ সৃষ্টিতে এই কাঠামো আরো শক্তিশালী হয়। এই কাঠামো বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের নিম্নতম স্তর বলে বিবেচিত হতে পারে। এই কাঠামোর মূল্যায়ন, তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন অত্যন্ত দুর্বল ও শ্লথ। এই কাঠামোকে সত্যিকারভাবে ব্যবহারের জন্য একে স্থানীয় শাসনের অংশীভূত করা উচিত ছিল। সেজন্য প্রয়োজন হলো দায়িত্বশীল ও স্বয়ম্ভর জেলা বা উপজেলা সরকার। তার কোন চিন্তাভাবনা বর্তমান (১৯৯৮ সালের) আইনে রূপলাভ করেনি। সৌভাগ্যের বিষয় যে দু'বছরেও এই পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই ঠুঁটো জগন্নাথ পরিষদকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং সেই সুযোগটি এখনই হাজির হয়েছে।'

দুর্ভাগ্যবশত সে সুযোগটি আমরা এবারো হারালাম। শুধু তাই নয় সংবিধানকে পদদলিত করে, আদালতের রায় উপেক্ষা করে এবং জনস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সাংসদদের অন্যায় আবদার রক্ষার জন্য যে উপজেলা আইন পাশ করা হয়, তা ভবিষ্যতে একটি অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। ইতিহাসের শিক্ষা হলো যে, অন্যায়, অনৈতিকতা ও অরাজকতার পরিণতি মঙ্গলকর হয় না। তবে এর পরিণতি শুধু ক্ষমতাসীন দলকেই নয়, সম্ভবত পুরো জাতিকেই ভবিষ্যতে গুণতে হবে। প্রসঙ্গত, ভাবতেও অবাক লাগে যে, জেলা পরিষদ গঠন না করে, শৃঙ্খলিত একটি উপজেলা পরিষদ সৃষ্টি করে, ইউনিয়ন পরিষদকে অকার্যকর করে এবং ক্ষমতা, দায়-দায়িত্ব ও সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ না করে ক্ষমতাসীন সরকার দিনবদলের স্বপ্ন দেখছে!